চতুর্থ অধ্যায়

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে নারীর রূপ বর্ণনার ভাষা

চতুর্থ অধ্যায়

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে নারীর রূপ বর্ণনার ভাষা

শিল্পী সাহিত্যিক সকলেই মৌল স্বভাবে কম বেশী কবি-সত্তার অধিকারী। তাঁদরে অন্তরমানসের বিশেষ এই দিকটির উৎসারণ ঘটে কাব্যময় বর্ণনায়—যা নারীর রূপবর্ণনায় বা নিসর্গবর্ণনায় উচ্ছ্বসিত হয়। নারী এবং নারীকেন্দ্রিক যাবতীয় সূক্ষ্ম অনুভব শিল্পস্রষ্টার চিরকালীন প্রেরণাস্থল' যা যুগ থেকে যুগান্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। সাহিত্যশিল্পে নারী বিশেষত নায়িকাদের রূপবিশ্লেষণ ভাষা দেহে প্রাণময় দ্যোতনা সঞ্চার করে। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য থেকে শুরু করে আধুনিক সাহিত্যেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। শিল্পীর শিল্পশক্তি যেন উজাড় হয়, এই রূপের বর্ণনায়। ভাষা মানসী প্রতিমাকে মূর্ত করে তোলে। বিভিন্নশিল্পীর বিচিত্র ভাষা নারীরূপকে দ্যুতিময়ী করে তোলে। ফলে ভাষা ব্যঞ্জিত হয় বিভিন্ন মাত্রায়ও বর্ণে।

শরৎ-পূর্ববর্তী সাহিত্যে নায়িকা চরিত্রের রূপবর্ণনা ছিল একটি অবশ্য উল্লেখ্য প্রসঙ্গ। নারীর রূপ-সৌন্দর্যের উপরই নারীর মূল্য নির্ধারিত হত। বর্তমানে নারীর মূল্যায়নের মাপকাঠি রূপসৌন্দর্য থেকে ব্যক্তিত্বে উন্নীত হয়েছে। নারীর রুচি, আচরণ, বুদ্ধি অনুভূতি এককথায় সামগ্রিক ব্যক্তিত্ব আধুনিক সমাজ তথা সাহিত্যে নতুন অর্থ এনে দিয়েছে। রূপবর্ণনায় প্রসঙ্গ তাই ক্রমেই বাহ্যিক প্রসঙ্গে পর্যবসিত হয়েছে।

উপন্যাস-সাহিত্যের পথিকৃৎ বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাস-কর্মে এ বিষয়ে অত্যন্ত স্পর্শকাতর ছিলেন। নারীর রূপ তার রচনায় অসাধারণত্বে দীপ্তিময়ী ছিল। মূলত বঙ্কিম রোমান্স প্রিয় ছিলেন। নারীর অসামান্য অগাধ রূপ সমুদ্রে পুরুষের মুগ্ধ বিহ্বল পথভ্রষ্টতাকে তিনি নির্দেশ করেছেন। নীতিবাদী বঙ্কিমচন্দ্র তাই পুরুষের রূপজমোহকে চিত্তবিকৃতিকে একমাত্র কারণরূপে চিহ্নিত করায় নারীর রূপবর্ণনায় ভাষায় যেন একটু অতিরেক লক্ষ করা যায়।

বঙ্কিম রচিত *কপালকুণ্ডলা* উপন্যাসটিতে নবকুমারকে কপালকুণ্ডলার রূপরাশি দেখে বিমোহিত হতে দেখা যায়। যে অবর্ণনীয় অপরূপ রূপ মাধুরী দেখে নবকুমারের হৃদয় আবিষ্ট তার বর্ণনাটি এই —*'কেশ তার অবেণীবদ্ধ সংসর্পিত রাশীকৃত আগুল ফলম্বিত কেশভার, তদগ্রে দেহরত্ন যেন চিত্রপটের উপর চিত্র দেখা যাইতেছে। অলকাবলীর প্রাচুর্যে মুখমণ্ডল সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হইতে ছিল না —তথাপি মেঘবিচ্ছেদ নিঃসৃত চন্দ্ররশ্মির ন্যায় প্রণীত হইতেছিল। বিশাল লোচনে কটাক্ষ অতিস্থির অতি স্নিগ্ধ অতি গম্ভীর অথচ জ্যোর্তিময়, সে কটাক্ষ এই সাগর হৃদয়ে ক্রিয়াশীল চন্দ্রকিরণ লেখার ন্যায় স্নিগ্ধোজ্জ্বল দীপ্তি পাইতেছিল।'*[১]—খণ্ড খণ্ড বাক্যাংশে গ্রথিত যৌগিক বাক্যে তৎসম ও সমাসবদ্ধ পদ 'কেশভার', 'চিত্রপট', 'দেহরত্ন', 'চন্দ্ররশ্মি', 'বিশাললোচন', 'চন্দ্রকিরণ-লেখা', 'মেঘবিচ্ছেদ নিঃসৃত', 'অবেণীসম্বন্ধ' প্রভৃতির প্রয়োগ সাধুগদ্যে ছন্দময়তা এনেছে। রূপবর্ণনার এই অতিশয়তা চরিত্রটিকে রহস্যময়ী করে তুলেছে।

চন্দ্রশেখর উপন্যাসেও ঘুমন্ত শৈবলিনীর রূপের বর্ণনা অসাধারণ পর্যায়ে পৌঁছিয়েছে — *'চিত্রিত ধনুঃখণ্ডবৎ নিবিড় কৃষ্ণ ভ্রুযুগলে মুদ্রিত পদ্মকোরক সদৃশ লোচন পদ্ম দুটি মুদিয়া রহিয়াছে — সেই প্রশস্ত নয়নপল্লবে সুকোমলা সমগামিনী রেখা দেখিলেন। দেখিলেন ন্যস্ত হইয়াছে — যেন কুসুমরাশির উপরে কে কুসুম ঢালিয়া রাখিয়াছে। মুখমণ্ডলে করসংস্থাপনের কারণে সুকুমার রসপূর্ণ তাম্বুল রাগরক্ত ওষ্ঠাধর ঈষদ্ভিন্ন করিয়া মুক্তাসদৃশ দন্তশ্রেণী কিঞ্চিৎমাত্র দেখা দিতেছে।'*[২]— তৎসম সমাসবদ্ধ শব্দ 'ধনুঃখণ্ড', 'পদ্মকোরকসদৃশ', 'নয়নপল্লব', 'তাম্বুলরাগরক্ত', 'ঈষদ্ভিন্ন' ইত্যাদির সুপ্রয়োগ ও উপমা অলংকার 'ধনুঃখণ্ডবৎ' ও 'যেন কুসুমরাশির উপরে কে কুসুমরাশি' ইত্যাদি উৎপ্রেক্ষা অলংকারের ব্যবহারে ভাষা ছবি হয়ে উঠেছে। সরল ও জটিল বাক্যযোগে গঠিত বিবৃতিটি সৌন্দর্যময়ী নারীর অপরূপ দেহকান্তিকে তুলে ধরেছে।

ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ নরনারীর হৃদয়গত রহস্যে অবগাহন করে পারস্পরিক সম্পর্কের জটিলতাকে অনুভবময় সূক্ষ্মতায় রূপদান করেছেন। তিনি নারীর রূপবর্ণনাকে অযথা দীর্ঘায়ত না করে সংক্ষিপ্ততার পক্ষপাতী ছিলেন।

চোখের বালি উপন্যাসে কেন্দ্রীয় নারী চরিত্র বিনোদিনীর রূপবর্ণনায় রবীন্দ্রনাথের ব্যঞ্জনাময় সংক্ষিপ্ত ভাষা এ প্রসঙ্গে লক্ষণীয়—*'বিনোদিনী যখন তাহার জোড়া ভুরু ও তীক্ষ্নদৃষ্টি তাহার নিখুঁত মুখ ও নিটোল যৌবন লইয়া উপস্থিত হইল তখন আশা অগ্রসর হইয়া তাহার পরিচয় লইতে সাহস*

করিল না'[৩]—সাধু গদ্যে জটিল বাক্যবন্ধে বিনোদিনীর রূপের সংক্ষিপ্ত চিত্রময় বর্ণনা পাঠকচিত্তে গভীর প্রভাব রেখেছে এবং তার আকর্ষণীয় আগমন উপন্যাসের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাময় জটিলতার আভাস দিয়েছে।

ঘরে বাইরে উপন্যাসটিতেও ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ 'বিমলার রূপ' সন্দীপের ভাষায় বর্ণনা করেছেন —*'লম্বা ছিপছিপে গড়ন, যাকে আমাদের রূপরসজ্ঞ লোকেরা নিন্দে করে ঢ্যাঙা। ওর ঐ লম্বা গড়নটিই আমাকে মুগ্ধ করে। ... ওর রঙ শ্যামলা - কী তেজ আর কি ধার।'*[৪]— ছোটো ছোটো বাক্যাংশে গ্রথিত চলিত গদ্যে বিমলার রূপ পাঠাবার হৃদয়ে আঁকা হয়েছে। সাদামাঠা এই বর্ণনার অন্তরালে চরিত্রের অন্তর্নিহিত স্বরূপ-তার আকর্ষক ব্যক্তিত্ব প্রকাশিত হয়েছে। ও এই আকর্ষণী চুম্বক শক্ত উপন্যাসটির মূল সমস্যার কেন্দ্রবিন্দু হয়েছে।

শরৎসাহিত্যে বৈচিত্র্যময়ী নারীকে আমরা বারবার পেয়েছি। এরা কেউ কেউ অসাধারণ রূপসী হলেও তাঁদের রূপবর্ণনায় তিনি খুবই মিতবাক সংযত এমনকি দ্বিধান্বিত বলা যায়। এর কারণ হিসাবে বলতে পারা যায় শুধুমাত্র বর্ণনার জন্য বর্ণনাতে তিনি উৎসাহী ছিলেন না তাই অহেতুক আড়ম্বরের বিরোধী ছিলেন তিনি। তাছাড়া, নারী রূপ বর্ণনা ও নিসর্গ বর্ণনা ঔপন্যাসিকের কবিত্বশক্তিকে তুলে ধরলেও এটি মূলত উপন্যাসের বস্তুধর্মিতার বিরোধী। শরৎচন্দ্র এ বিষয়টি সম্পর্কে যথাসম্ভব সচেতন ছিলেন।

শরৎচন্দ্রের নারীরা চারপাশের বাস্তব পরিবেশ থেকে উঠে এসেছেন তাই বর্ণময় রূপবর্ণনার প্রয়োজন তিনি অনুভব করেননি।

এ সমস্ত নারীরা সকলেই কমবেশি বহুবিধ জীবনে গুরুতর সমস্যার জালে ও প্রবৃত্তির টানাপোড়েনে ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত। তাদের জীবনের জটিলতা ও অন্তর্দ্বন্দ্বময় হৃদয়বৃত্তির বিশ্লেষণেই তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল, বাহ্যিক রূপবর্ণনায় তিনি অনাগ্রহী ছিলেন। পুরুষচিত্তকে আকর্ষণ করবার চিরাচরিত প্রচলিত এই প্রক্রিয়াকে তিনি পরিহার করেছেন বলা যায়। এ ছাড়া এঁরা অধিকাংশই পরিণত যৌবনের প্রশান্তি সমাহিত। তাই নবযৌবনের উচ্ছল কামনাবিহ্বল চঞ্চলতা তাঁদের নেই বললেই চলে। এদের অন্তরের সৌন্দর্যময় দীপ্তির কাছে রূপসৌন্দর্য নেহাৎই ম্লান হয়ে যায়। ভাষাশিল্পে এই বর্ণনা দানে শিল্পী আলংকারিক কারুকার্য তথা অপ্রচলিত তৎসম শব্দ ও সমাসবদ্ধ পদের গুরুভার বর্জন করেছিলেন। যার ফলস্বরূপ তাঁর ভাষারূপ স্বতঃস্ফূর্ত স্পর্শে সহজ

স্বাভাবিক ও জীবনগন্ধী হয়ে উঠেছিল। রূপ নেহাতই বাহ্যিক প্রদর্শনে শেষ না হয়ে অন্তরের স্পর্শে দ্যুতিময়ী আভা লাভ করেছিল।

শরৎচন্দ্রের নারীর রূপ বর্ণনার প্রসঙ্গ আলোচনায় সমালোচক ড. অজিত কুমার ঘোষ তাঁর জীবন শিল্পী শরৎচন্দ্র গ্রন্থটিতে লিখেছেন—*'রূপবর্ণনার জন্য কোন আয়োজন নেই, কোন আড়ম্বর নেই, ক্রিয়া ও কথার ফাঁকে ফাঁকে তাঁর সংযত তুলির দু-একটি আঁচড়ে হয়তো কোন নারী চরিত্রের রূপ ক্ষণস্থায়ী বিদ্যুৎ আলোকের মত ঝলসে ওঠে। সেই বর্ণনা পরিবেশের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলে মিশে থাকে এবং তা অকারণে আনা হয় না, নিকটবর্তী কোন পুরুষ চরিত্রের মধ্যে বিস্ময় ও চাঞ্চল্য জাগাবার উদ্দেশ্যেই শিল্পের প্রয়োজনীয় উপাদানরূপেই তাকে স্থান দেওয়া হয়।'*[৫]

তাঁর উপন্যাসগুলিকে কালানুক্রমিক ভাবে আলোচনা করে নারীরূপ বর্ণনায় তাঁর বিশেষত্ব ও স্বতন্ত্রতা খোঁজার চেষ্টা করব ও বিস্মিত হব তাঁর সংক্ষিপ্ত ও সুমিত উপস্থাপনা রীতিকে দেখে যা সমকালের প্রেক্ষিতে ছিল ঈর্ষণীয় এক বস্তু রূপবর্ণনা কখনও তিনি করেছেন লেখকের দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ ভাবে, আবার কখনও তিনি করেছেন পরোক্ষভাবে অপর চরিত্রের দৃষ্টিভঙ্গিতে। তবে সর্বত্রই সংক্ষিপ্ততা ও বাক্‌সীমিতি ছিল এর বিশেষ গুণ।

তাঁর প্রথম উপন্যাস *বড়দিদি* তে নায়িকা মাধবীর রূপের তথাকথি দৈহিক অনুপুঙ্খ বর্ণনা নেই বরং তার ব্যক্তিত্বের নারীত্বময় স্পর্শ আমরা অনুভব করি —সাধুভাষায় সাবলীল সেই বর্ণনা যেন ছন্দিত হয়েছে —*'কিন্তু যেদিন হইতে মাধবী তাহার ভাদ্র মাসের ভরা গঙ্গা মত রূপ, স্নেহ মমতা লইয়া পিতৃভবনে ফিরিয়া আসিল, সেই দিন হইতে যেন সমস্ত সংসারে নবীন বসন্ত ফিরিয়া আসিয়াছে। এখন সবাই কহে বড়দিদি, সবাই বলে মাধবী।'*[৬] —যৌগিক বাক্যবন্ধে 'ভাদ্রমাসের ভরা গঙ্গা'র ব্যাপ্তির সঙ্গে মাধবীর স্নেহমমতা পূর্ণ কোমল হৃদয় উপমিত হয়ে নারীর মাতৃময়ী পূর্ণ রূপ ব্যঞ্জিত হয়েছে। নারীর রমণীয় রূপ যে তার কল্যাণ মূর্তিতে উদ্ভাসিত সেটি লেখক উদ্ঘাটিত করেছেন। বিধবা মাধবীর পিতৃগৃহে ফিরে আসার প্রসঙ্গটি শীত শেষে প্রকৃতি রাজ্যে বসন্ত আগমনের আনন্দ বার্তার সূচনা করেছে। উৎপ্রেক্ষা অলংকার সাধু বিবৃতিটিতে কাব্যময়তা এনেছে এবং 'সবাই' শব্দটি অনুপ্রাসের মত বেজে উঠেছে।

বিরাজ বৌ উপন্যাসটিতে পল্লীবধূ বিরাজের অসামান্যা সৌন্দর্য ভাষাশিল্পী পরোক্ষভাবে অন্যের দৃষ্টিতে চিত্রিত করেছেন—*'মানুষের এত রূপ হয় সহসা এ কথাটা যেন সে বিশ্বাস করিতে পারিল না। কিন্তু আর সে চোখ ফিরাইতেও পারিল না। অপলক দৃষ্টিতে চিত্রার্পিতের ন্যায় সেই অতুল্য অপরিসীম রূপরাশি বিভোর হইয়া দেখিতে লাগিল।'*[৭]

জটিল ও যৌগিক বাক্যে বিরাজ বৌ এর রূপ 'এত' 'সহসা' ইত্যাদি অব্যয় পদ-সহকারে অপর বিস্মিত অভিভূত ব্যক্তিহৃদয়ের অভিব্যক্তি হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। 'অতুল্য' 'অপরিসীম' ইত্যাদি বিশেষণ পদের সুপ্রয়োগ বর্ণনাকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা দিয়েছে। নারীরূপের প্রতি পুরুষের আসঙ্গলিপ্সা বর্ণনায় ব্যক্ত হয়েছে। সাধু ভাষা আবেগঘন আবেদন ময় হয়েছে।

পরবর্তী *পরিণীতা* উপন্যাসটিতে নায়িকা ললিতার রূপবর্ণনাও অতি সংক্ষিপ্ত—মামা গুরুচরণের মুখে বর্ণিত —*'ও একটু শ্যামবর্ণ বটে, কিন্তু চোখ মুখ, এমন হাসি, এত দয়াময়ী পৃথিবী খুঁজে বেড়ালেও কেউ পাবে না।'*[৮] —যৌগিক বাক্যে 'বটে' ক্রিয়াপদের ব্যবহারে 'এত' ও 'এমন' ইত্যাদি অব্যয় পদ যোগে শ্যামলা মেয়েটির বাহ্যিকরূপের অন্তরালে স্নিগ্ধ প্রসন্ন ভালবাসাময় অন্তরটি ধরা পড়ে। ভাষা ব্যবহারে সংক্ষিপ্ততা এ বর্ণনার বৈশিষ্ট্য হয়েছে।

এরপর *পণ্ডিতমশাই* উপন্যাসে নায়িকা কুসুমের রূপের বর্ণনাতেও সংক্ষিপ্ত দ্রুততা চোখে পড়ে —*'এখন সে ষোল বৎসরের যুবতী—তাহার দেহে রূপ ধরেনা।'*[৯] —যৌগিক বাক্যে সহজ সাধু গদ্যে কুসুমের যৌবনবতী পরিপূর্ণ রূপ ভাষায় ছন্দিত হয়েছে।

এই উপন্যাসেই অন্যত্র শিল্পী কুসুমকে চিত্রিত করেছেন—*'তাহার সিক্ত বসনে যৌবনশ্রী আঁটিয়া রাখিতে পারিতেছিল না। দেহের তপ্তকাঞ্চনবর্ণ ভিজা কাপড় ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। আর্দ্র এলোচুলের রাশি সমস্ত পিঠ ব্যাপিয়া জানু স্পর্শ করিয়া ঝুলিতেছিল।'*[১০]—সরল বাক্যে সাধু গদ্যে রচিত বিবৃতিতে নারীর রমণীয় রূপ ভাষায় অঙ্কিত হয়েছে। সমাসবদ্ধ পদ 'সিক্ত বসন' 'তপ্তকাঞ্চনবর্ণ' 'যৌবন-শ্রী' ইত্যাদি প্রয়োগ সুপ্রযুক্ত হয়েছে—পাশাপাশি তৎসম শব্দ 'জানু', 'আর্দ্র' ইত্যাদির ব্যবহার ও অসমাপিকা ক্রিয়াপদ 'আঁটিয়া রাখিতে' 'ফুটিয়া' 'ব্যাপিয়া' 'করিয়া'র প্রয়োগে নারীদেহের উচ্ছলিত লাবণ্যের অসীমত্ব যেন ভাষায় রূপময় হয়েছে।

রূপবর্ণনার পরোক্ষ রীতি-অপরের মানসদৃষ্টিতে যা বর্ণিত-সেটি পরবর্তী তার অপর উপন্যাস *পল্লীসমাজে*ও দেখা যায়। কেন্দ্রীয় চরিত্র 'রমা'র দেহসৌন্দর্য রমেশের অভিভূত দৃষ্টিতে ব্যক্ত এ

ভাষায়—*'রমেশ মুগ্ধের মত চাহিয়া রহিল। এ কী ভীষণ উদ্দাম যৌবন শ্রী ইহার আর্দ্র বসন বিদীর্ণ করিয়া বাহিরে আসিতে চাহিয়াছিল'*[১১] —রমেশের মুগ্ধতাজনিত উপলব্ধি তৎসম শব্দ 'উদ্দাম' 'যৌবন শ্রী', 'আর্দ্র বসন', ইত্যাদি ব্যবহারের পাশাপাশি 'বিদীর্ণ করিয়া' ইত্যাদি সংযোগ মূলক ধাতু ব্যবহারে ও 'আসিতে চাহিয়াছিল' - যৌগিক ক্রিয়াপদের প্রয়োগে পুরুষের আসক্তিঘন হৃদয়ের বাসনাকে তুলে ধরেছে। রূপবর্ণনার সাধু ভাষা বাহ্যিক দৈহিক গঠনের বর্ণনাকে ছাপিয়ে ক্রমেই ব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠেছে।

এই উপন্যাসের জ্যাঠাইমা বিশ্বেশ্বরী চরিত্রের দৈহিক বর্ণনায় উপন্যাসকার নারীর কল্যাণময়ী মাতৃমূর্তি রূপকে অঙ্কন করেছেন এ ভাষায় —'মাথার চুলগুলি ছোট করিয়া ছাঁটা, সুমুখেই দুই একগাছি কুঞ্চিত হইয়া কপালের উপর পড়িয়াছে। চিবুক, কপোল, ওষ্ঠাধর, ললাট সবগুলি যেন কোন বড় শিল্পীর বহু যত্নের বহু সাধনার ফল।'[১২] ছোটো ছোটো বাক্যাংশে গ্রথিত যৌগিক বাক্যটি যেন চিত্রধর্মিতা পেয়েছে। চরিত্রটির দীপ্তিময়ী সৌন্দর্য 'কুঞ্চিত', 'কপোল', 'ওষ্ঠাধর', 'ললাট', 'সাধনা' ইত্যাদি তৎসম শব্দ ব্যবহারে উন্মোচিত হয়েছে। সাধু ভাষা বর্ণনাকে ছাপিয়ে ছবি হয়ে উঠেছে।

শরৎচন্দ্রের অপর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'শ্রীকান্ত'-র মূল নায়িকা চরিত্র রাজলক্ষ্মী যেন শিল্পীর তুলিকায় দ্রুত অঙ্কিত। শিকার পাটিতে হঠাৎই শ্রীকান্ত তাকে দেখে এভাবে—*'বাঈজী সুশ্রী অতিশয় সুকণ্ঠ এবং গান গাহিতে জানে।'*[১৩] —সাধুগদ্যে যৌগিক বাক্যবন্ধে সহজ সাধু ভাষায় বিশেষণপদ সুশ্রী' অতিশয় সুকণ্ঠ ও 'গাহিতে জানে' যৌগিকক্রিয়া ব্যবহারে নারী চরিত্রটি রূপময় হয়েছে ও শ্রীকান্ত চরিত্রকে মুগ্ধ করেছে।

এই রাজলক্ষ্মী চরিত্রের পতিতা পরিচয়ের অন্তরালে শুদ্ধ পবিত্রময়ী নারী ব্যক্তিত্বের রূপ ভাষায় ধরা আছে —*'গঙ্গার ঘাটে পাণ্ডার দেওয়া শ্বেত ও রক্তচন্দনের তিলক তাহার ললাটে, পরণে নতুন রাঙা বারানসী শাড়ি, পূবের জানালা দিয়া এক টুকরা সোনালী রোদ আসিয়া বাঁকা হইয়া তাহার মুখের একধারে পড়িয়াছে, সলজ্জ কৌতুকের চাপা হাসি তাহার ঠোঁটের কোণে।'*[১৪]—পতিতা নারীর মহিমাময়ী রূপে উদ্ভাসিত করে তোলার জন্য, ছোটো ছোটো টুকরো বাক্যাংশে যৌগিক বাক্যবন্ধের মালায় সাধুভাষা উজ্জ্বলতা পেয়েছে। 'সলজ্জ কৌতুক', 'চঞ্চল চোখ', 'চাপা হাসি' ইত্যাদি বিশেষণের ব্যবহার সাধু বিবৃতিতে নারী রূপকে উচ্ছ্বসিত করেছে।

এই উপন্যাসেই অন্যতমা স্ত্রী চরিত্র অন্নদা দিদি-র রূপাঙ্কনে ভাষাশিল্পী শরৎচন্দ্রের মিতভাষিতা ভাবদ্যোতক হয়ে উঠেছে। বর্ণনাটি এই —*'যেন ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি। যেন যুগ যুগান্তব্যাপী কঠোর তপস্যা সাঙ্গ করিয়া তিনি এই মাত্র আসন হইতে উঠিয়া আসিলেন,'*[১৫] —সরল বাক্যবন্ধে ধ্রুপদী শব্দচয়নে 'ভস্মাচ্ছাদিত' 'বহ্নি' 'যুগযুগান্তব্যাপী' 'তপস্যা' ইত্যাদির প্রয়োগে নারীর কল্যাণময়ী শুদ্ধ পবিত্ররূপ উন্মোচিত হয়েছে। 'যেন' এই অব্যয়পদটি অনুপ্রাসের মত গদ্যে বারবার ছন্দিত হয়ে উৎপ্রেক্ষা অলংকারের সৌন্দর্যময়তাকে তুলে ধরেছে। বর্ণনা সাধুভাষার বাহ্যিক স্তর ভেদ করে অন্তরে প্রবেশ করেছে।

বস্তুত 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের চারটি পর্বই পুরুষ চরিত্রের পাশাপাশি বহু নারীর জীবনাবেদনে বিধৃত। প্রতিটি নারীই তাদের স্বতন্ত্র চেহারায় প্রকাশিত। তাঁরা তাদের রূপগত সীমাবদ্ধতাকে ছাপিয়ে জীবনভাবনার বলিষ্ঠ প্রকাশে ব্যাপ্তময়ী হয়েছে। অভয়া, সুনন্দা, কমললতা তাই পরিচিত চেহারায় অপরিচিত ভাবে প্রকাশিত হয়। নারীর সাধারণরূপ বর্ণনাগুণে অসাধারণ হয়ে ওঠে।

'অভয়া'র রূপ শ্রীকান্তের দৃষ্টিতে বর্ণিত হয়েছে এ ভাবে—*'সে খুব সুন্দর বলিলে তর্ক উঠিবে, কিন্তু তাহা অবহেলা করিবার জিনিস নয়। কারণ, বড় কপাল স্ত্রীলোকের সৌন্দর্যের তালিকার মধ্যে স্থান পায় না জানি, কিন্তু এই তরুণীর প্রশস্ত ললাটের উপর এমন একটু বুদ্ধি ও বিচারের ক্ষমতা ছাপমারা দেখিতে পাইলাম যাহা কদাচিৎ দেখিয়াছি। ... সিঁথায় সিন্দুর ডগডগ করিতেছে, হাতে নোয়া ও শাঁখা -- আর কোন অলঙ্কার নাই, পরণে একখানি নিতান্ত সাদাসিধা রাঙাপেড়ে শাড়ি।'*[১৬] —নারীর প্রথাগত রূপবর্ণনার ভাষা এ নয় বরং বলা যায় যে গাঠনিক সৌন্দর্যের ঊর্ধ্বে ব্যক্তিত্বময় সৌন্দর্যের যে দীপ্তি পুরুষ চিত্তকে প্রভাবিত করেছে তাই নারীটির সাধারণ বেশবাসে ও নিরলংকার মূর্তিতে ধরা দিয়েছে। যৌগিক বাক্যগঠনে, সাধুগদ্যে স্বচ্ছন্দভঙ্গিতে চলিত ধ্বন্যাত্মক শব্দ 'ডগডগ' ও 'পরণে' 'রাঙাপেড়ে' ইত্যাদি ব্যবহারিক শব্দ প্রয়োগে ভাষা চিত্রাত্মক রূপ পেয়েছে।

'শ্রীকান্ত' উপন্যাসেরই তৃতীয় পর্বে সুনন্দার উপস্থাপনাও লেখক অতিসাধারণ ভাবে ঘটিয়েছেন যার রূপ বেশবাসের সর্বত্রই মলিনতা অথচ এই সাধারণ নারী তার প্রতিবাদী সত্তায় কেমন অসাধারণ হয়ে ওঠে তারই বর্ণনার ভাষাটি হল এই —*'উনিশ - কুড়ি বছরের শ্যামবর্ণ একটি মেয়ে ... এই যে আমাদের সাধারণ বাঙালী-ঘরের সামান্য একটি মেয়ে, বাহির হইতে যাহার কোন বিশেষত্ব নাই - না আছে রূপ, না আছে বস্ত্র-অলঙ্কার; এই ভগ্নগৃহের যেদিকে দৃষ্টিপাত কর, কেবল*

অভাব-অনটনের ছায়া কিন্তু তবুও সে যে ওই ছায়ামাত্রই, তার বেশি কিছু নয়।"[১৭] —গড়পরতা সাধারণ বাঙালি রমণীর নিতান্ত সাধারণ চেহারার বর্ণনাটি ছাপিয়ে শ্যামলা মেয়েটি তার বিদ্রোহী ও দুঃখজয়ী মনোভাবে সকল চরিত্রের ভিড়ে অনন্যা হয়ে উঠেছে। যৌগিক ও জটিল বাক্যবন্ধে গঠিত বিবরণে নারীরূপ যেন ব্যক্তিত্বময়ী হয়ে উঠেছে সাধু ভাষায়। এই নিরাভরণ রীতিতে বর্ণনা কল্পটি পাঠকমনকে সহজেই আকৃষ্ট করে —এখানেই উপন্যাসকারের ভাষাসৃজনের পটুতা।

এই উপন্যাসের চতুর্থ পর্বে বৈষ্ণবী কমলতার রমণীয় ব্যক্তিত্ব আমাদের মুগ্ধ করে। শ্রীকান্তের সঙ্গে তার এক বিচিত্র সম্পর্ক — প্রণয়েরই এক অস্পষ্টতা যেন তার অভিব্যক্তিতে। নারীটির রূপের সংক্ষিপ্ত সাধারণ বর্ণনাটি আমাদের প্রকৃতই অবাক করে। *'বয়স ত্রিশের বেশি নয়, শ্যামবর্ণ আঁটসাট ছিপছিপে গড়ন, হাতে কয়েকগাছি চুড়ি — হয়ত পিতলের সোনার হইতেও পারে, চুল ছোট নয়, গেরো দেওয়া পিঠের উপর ঝুলিতেছে, গলায় তুলসীর মালা, হাতে থলির মধ্যেও তুলসীর জপমালা।*"[১৮]—ছোটো ছোটো বাক্যাংশে গ্রথিত দীর্ঘ যৌগিক বাক্যবন্ধে সাধুসরল গদ্যে বর্ণনাটি চিত্রিত হয়ে নারীর সহজাত স্নিগ্ধ এক প্রসন্নময়, ব্যক্তিত্বকে তুলে ধরেছে। 'আঁটসাট, 'ছিপছিপে', 'গেরো', 'ছাপছোপ' ইত্যাদি কথ্য শব্দের প্রয়োগে বর্ণনা যেন প্রত্যক্ষতা পেয়েছে।

'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের পরে 'দেবদাস'-এর নায়িকা পার্বতীর অপরূপ সৌন্দর্যের বর্ণনাও লেখক স্বভাবসিদ্ধ সংক্ষিপ্ততায় সম্পন্ন করেছেন—*'মেয়েটি অতিশয় সুশ্রী।*"[১৯] —ভাষা এখানে অতিমাত্রায় সংক্ষিপ্ত। এরপর 'চরিত্রহীন' উপন্যাসটিতে প্রধানা নারী কিরণময়ীর রূপ বর্ণনার ভাষাতে লেখকের মানব-মনস্তত্ত্ব সম্পর্কিত অভিজ্ঞহৃদয়টি ধরা পড়ে। পুরুষ চরিত্রকে রূপের জালে বন্দি করায় নারীর যে ক্ষমতা সেটিই শানিত ও দীপ্তিময়ী ভাষায় কিরণয়ীর রূপসৌন্দর্য ও বেশবাশে প্রকাশিত— *'নিখুঁত সুন্দর মুখের উপর হাতের আলোকসম্পাতে ভ্রুযুগের মধ্যে সন্নিবিষ্ট কাঁচ পোকার টিপ চিকচিক করিয়া উঠিল এবং ঈষৎ আনত চোখ দুটি দিয়া যে বিদ্যুৎপ্রবাহ বহিয়া গেল, চতুর্দিকের নিবিড় অন্ধকারে তাহার অপূর্ব জ্যোতি ক্ষণকালের জন্য উভয়কেই বিভ্রান্ত করিয়া ফেলিল।*"[২০]— নারীরূপের দাহিকা-শক্তি-তার মোহিনী মায়া সাধুগদ্যভাষায় যৌগিক দীর্ঘ বাক্যবন্ধে তৎসম শব্দ চয়নে 'আলোকসম্পাত' 'সন্নিবিষ্ট' 'বিদ্যুৎপ্রবাহ' 'জ্যোতি' ইত্যাদির প্রয়োগে বর্ণময় হয়ে উঠেছে ও পাশাপাশি 'চিকচিক' ইত্যাদি ধ্বন্যাত্মক শব্দের প্রয়োগে ও 'টিপ' ইত্যাদি কথ্য শব্দ ব্যবহারে ভাষা ইন্দ্রিয়ঘন আবেদনাত্মক হয়েছে। অতৃপ্তা নারীর প্রেম-বুভুক্ষু অন্তরটিকে মেলে ধরেছে। এ বর্ণনায়,

মনস্তত্ত্ব মিশে গিয়ে ভাষাকে শরীরী রূপ দিয়েছে।

এই উপন্যাসের অপর প্রধানা নারী মেসের দাসী 'সাবিত্রী'—যার উপস্থাপনায় কোনো বিশেষ আয়োজন নেই। একেবারেই সাদামাঠ তার বর্ণনা—*'একহারা অতি সুশ্রী গঠন। বয়স বোধ করি একুশ বাইশের কাছাকাছি, কিন্তু মুখ দেখিয়া আরও কম বলিয়া মনে হয়। সাবিত্রী ফরসা কাপড় পরিত এবং ঠোঁট দুটি পান ও দোক্তার রসে দিবারাত্রি রাঙ্গা করিয়া রাখিত।'*[২১]—সরল বাক্য ও যৌগিক বাক্যে, সাধুগদ্যে নারীরূপটি চিত্রিত হয়েছে। তৎসম শব্দ, 'সুশ্রী', 'গঠন' 'দিবরাত্রি' ইত্যাদির পাশাপাশি, 'ঠোঁট' 'পান' রাঙ্গা ইত্যাদি তদ্ভব শব্দের ও দোক্তা ইত্যাদি দেশি শব্দের ব্যবহারে ভাষা চিত্রকল্প হয়ে উঠেছে। স্নিগ্ধ-হাস্যময়ী নারীটি সহজ ভঙ্গিতে আমাদের মন ছুঁয়ে যায় —যেন আমাদের অতি-চেনা পড়শী। এই নারীটিরই সাধারণ রূপের মধ্য দিয়ে প্রেমময়ী ও সেবাময়ী নারীর অসাধারণ ব্যঞ্জনাময়তা আমাদের মনকে শ্রদ্ধাশীল করে তোলে—*'এক বাটি গরম দুধ হাতে সাবিত্রী ঘরে ঢুকিয়া তাড়াতাড়ি সেটা পাশের টিপয়ের উপর নামাইয়া রাখিল। তাহার পরণে ধপধপে গরদের শাড়ি, সদ্যস্নাত সুদীর্ঘ সিক্ত কেশভার পিঠ ছাড়াইয়া নীচে ঝুলিয়া পড়িয়াছে, কয়েকটা চূর্ণকুন্তল মুখের উপর কপালের উপর আসিয়া পড়িয়াছে'*[২২]—সরল ও যৌগিক বাক্যের দীর্ঘ বিবরণে কল্যাণময়ী পবিত্র নারীত্বের স্পর্শ পাওয়া যায়। 'ধপধপে' ধ্বন্যাত্মক শব্দের পাশাপাশি তৎসম শব্দ 'সদ্যস্নাত', 'সুদীর্ঘ', 'সিক্ত', 'কেশভার', 'চূর্ণকুন্তল' ও 'মুখ', 'গরম', 'দুধ' ইত্যাদি তদ্ভব শব্দের স্বচ্ছন্দ সহাবস্থানে নারীটির মাতৃময়ী স্নিগ্ধ রূপটি মেসের ঝি-র খোলসের বাইরে প্রকাশিত হয়ে পরে যা সম্পূর্ণ এক অচেনা সত্তা।

শরৎচন্দ্রের নারী-রূপ বর্ণনার অপর যে রীতিটি যা পরোক্ষ ভাবে পুরুষের মোহ-মুগ্ধ চিত্তের অভিব্যক্তিতে ধরা পরে, তা 'দত্তা' উপন্যাসে 'বিজয়া'—এই নারীটির প্রতি নরেনের উক্তিতে উচ্ছ্বসিত হয়েছে—*'আমি নিশ্চয় বলতে পারি যে ছবি আঁকতে জানে তারই আপনাকে দেখে আজ লোভ হবে'*[২৩] —জটিল বাক্যবন্ধে চলিত গদ্যে ভাষা স্বচ্ছন্দতা পেয়েছে।

শরৎচন্দ্রের দত্তা-পরবর্তী প্রখ্যাত উপন্যাস 'গৃহদাহ'-এ প্রধানা নারী চরিত্র অচলার ব্যক্তিত্বময় বুদ্ধিদীপ্তরূপ আতিশয্যহীন মিত-সংযত ভাষণে বর্ণিত হয়েছে এভাবে—*'মেয়েটি উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, ছিপছিপে পাতলা গঠন। কপোল, চিবুক, ললাট সমস্ত মুখের ডৌলটিই অতিশয় সুশ্রী ও সুকুমার। চোখ দুটির দৃষ্টিতে একটি স্থিরবুদ্ধির আভা'*[২৪] —সাধু গদ্যভাষাতে সরল বাক্য এবং যৌগিক বাক্যে

নারী-রূপের পরোক্ষ বর্ণন শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ' পরবর্তী 'বামুনের মেয়ে' উপন্যাসেও পাওয়া

নারীরূপ উচ্ছ্বসিত হয়েছে। 'সুশ্রী' 'সুকুমার' ইত্যাদি বিশেষণ পদ-ব্যবহারে মেয়েটির চেহারা প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। শ্যামবর্ণা মেয়েটি তার বুদ্ধিদীপ্ত ব্যক্তিত্বে উপন্যাসে ত্রি-কোণ প্রেমের জটিলতা সৃষ্টি করেছে — প্রধান দুটি পুরুষ-চরিত্র তার প্রতি সমভাবে আকৃষ্ট হয়ে প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তি-জনিত বেদনাবোধে দীর্ণ হয়েছে।

এই উপন্যাসের অপর নারী চরিত্র কুড়ি-একুশ বৎসরের পাতলা ছিপছিপে মেয়ে মৃণালের বাইরের রূপ অপেক্ষা তার অন্তরের কল্যাণী রূপটি লেখক চিনিয়ে দিয়েছেন আমাদের এইভাবে —*'কোন প্রতিকূলতাই যেন দুঃখ দিয়া এই মেয়েটিকে তাহার জীবনযাত্রার পথে অবসন্ন করিয়া বসাইয়া দিতে পারেনা। হৃদয়ের আনন্দ-নিরানন্দ ছাড়া বাহিরের কোন-কিছুর যেন অস্তিত্ব নাই- এমনি এই মূর্খ পাড়াগাঁয়ের মেয়েটার ভাব। অনুক্ষণ সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া সে বেশ বুঝিতেছিল, পদ্ম যেমন পাঁকের মধ্যে জল লাভ করিয়াও মলিনতার অতীত, ঠিক তেমনি যেন এই লেখাপড়া না-জানা দরিদ্র পল্লী-লক্ষ্মীটিও সর্বপ্রকার সংসারিক দুঃখ-দারিদ্র্যের ক্রোড়ে অহোরাত্র বাস করিয়াও সমস্ত বেদনা-যন্ত্রণার উপরে অবলীলাক্রমে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। না আছে তাহার দেহের ক্লান্তি, না-আছে তাহার মুখের শ্রান্তি।'*[২৫] —জটিল বাক্যবন্ধে গঠিত বিবরণে সর্বংসহা নারীটির সহিষ্ণু হৃদয়কে খুঁজে পাই। 'না' এই নঞ-অব্যয় পদটির বাক্যের প্রথমে অবস্থানে সাধু ভাষা ছন্দময় রূপ পেয়েছে। বাংলার গৃহলক্ষ্মীর স্থির প্রসন্নময়ী চিরন্তন-রূপের ভাবগত বর্ণনায় শিল্পী শরৎচন্দ্রের নারী-সম্পর্কিত ভাবনা উঠে আসে এখানে।

নারী-রূপের পরোক্ষ বর্ণন শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ' পরবর্তী 'বামুনের মেয়ে' উপন্যাসেও পাওয়া যায়। এই উপন্যাসে বাংলার বিষাক্ত প্রথা কৌলীণ্য সমস্যা এবং যার মর্মান্তিক ফলশ্রুতির শিকার বহু নরনারীকে দুর্ভাগ্যের চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছেন তারই করুণ কাহিনি সংবেদনশীল লেখক তুলে ধরেছেন। লগ্নভ্রষ্টা কন্যা সন্ধ্যার বধূবেশ প্রেমিক অরুণের চোখে প্রতিফলিত হয়েছে এইভাবে—*'সন্ধ্যা মুখ তুলিয়া চাহিল। তাহার পরিধানের রাঙ্গা চেলীর সঙ্গে সর্বাঙ্গের অলঙ্কার জ্যোৎস্নায় জ্বলিতে লাগিল, সুন্দর ললাটে চন্দ্ররশ্মি পড়িয়া চন্দনের পত্রলেখা দীপ্ত হইয়া উঠিল এবং তাহারই ঈষৎ নিম্নে অশ্রুভরা আয়ত চোখ দুটি জ্বলজ্বল করিতে লাগিল।' নারীর এমন রূপ অরুণ আর কখনো দেখে নাই, সে যেন একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল'*[২৬] —সরল বাক্য ও যৌগিক বাক্যে শিল্পী সহজ সাধুগদ্যে বক্তব্যকে তুলে ধরেছেন। 'ললাট', 'চন্দ্ররশ্মি', 'পত্রলেখা', 'দীপ্ত', 'অশ্রু',

'সর্বাঙ্গ' ইত্যাদি তৎসম শব্দ বয়নে প্রেমিক হৃদয়ের বিহ্বল মুগ্ধতা প্রকাশিত হয়েছে।

'দেনা-পাওনা' উপন্যাসটি শরৎচন্দ্রের 'বামুনের মেয়ে' পরবর্তী একটি বিশিষ্টতম রচনা। *'চিরন্তন নরনারীর হৃদয়গত দেনা-পাওনার হিসাব নিকাশের উপর এই উপন্যাসটির কাহিনি গড়ে উঠেছে। ষোড়শী ভৈরবী ও জমিদার জীবানন্দের আশ্চর্য এক সম্পর্কের রসপরায়ণ এই উপন্যাসটি। ষোড়শীর রূপ মাতাল দুশ্চরিত্র জীবানন্দের অভিভূত দৃষ্টিতে ব্যক্ত হয়েছে তাহার গৈরিক বস্ত্র, তাহার এলায়িত রুক্ষ কেশভার, তাহার পাণ্ডুর ওষ্ঠাধর, তাহার সবল সুস্থ ঋজু দেহ, সমস্তই যে যেন দুই বিস্ফারিত চক্ষু দিয়া নিঃশব্দে গিলিতে লাগিল।'*[২৭] 'গৈরিক', 'এলায়িত', 'রুক্ষ', 'পাণ্ডুর', 'ঋজু' ইত্যাদি বিশেষণ পদের ব্যবহারে ভৈরবী ষোড়শীর সংযত কঠোর তেজস্বিণী ব্যক্তিত্ব তার সীমায়ত রূপকে অতিক্রম করে লুব্ধ পুরুষের চোখে অন্যতর মাত্রায় ব্যঞ্জিত হয়েছে ও পুরুষ মনকে আবিষ্ট করেছে। সাধুভাষা বর্ণনাকে চিত্রকল্প দিয়েছে। রমণীটির ব্যক্তিত্ব অন্য নারী অপেক্ষা যে ভিন্ন তা তার দৈহিক গঠনের বিশেষত্ব ব্যঞ্জিত হয়েচে ও অপরের দৃষ্টিতে বর্ণিত হয়েছে।

এই উপন্যাসের অপর নারী-চরিত্র হৈমের তথাকথিত দৈহিক বর্ণনা দেননি লেখক। তার তেজস্বী ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী রূপটি আমাদের চোখে ধরা দেয় ।-*"ভৈরবী অন্যায়ভাবে অভিযুক্ত হলে ও সর্বসমক্ষে তাকে মিথ্যে চাপিয়ে দেওয়া দোষ স্বীকার করতে বাধ্য হতে হলে হৈমের প্রতিবাদী দৃঢ় ভঙ্গি আমাদের মুগ্ধ করে —'আপনারা ওঁর বিচার করতে চান নিজেরাই করুন, কিন্তু ওঁর মায়ের কথা ওঁর নিজের মুখ দিয়ে কবুল করিয়ে নেবেন, এতবড় অন্যায় আমি কোনমতে হতে দেবনা।''*[২৮]— ~~যৌগিক ও~~ জটিলে গঠিত মিশ্র বাক্যবন্ধে 'কবুল' ইত্যাদি বিদেশি শব্দের স্বচ্ছন্দ ব্যবহারে চলিত গদ্যে নারীর ভাবগত রূপটি আমাদের চোখে ধরা দেয় যা দৈহিক বর্ণনার থেকে কিছু অংশে কম নয়।

~~'দেনা-পাওনা' পরবর্তী 'নববিধান' উপন্যাসটিতে শরৎচন্দ্রের দাম্পত্যজীবন ও দাম্পত্যপ্রেমের~~ প্রতি অনুরাগপূর্ণ অনুভূতি সহজ-স্বচ্ছন্দ গতিতে অভিব্যক্ত হয়েছে। বিবাহিতা নারীর শুচিস্নিগ্ধ পবিত্র রূপ ঊষার সহজ বেশবাসে ও আটপৌরে ভঙ্গিতে প্রকাশিত হয়েছে। অতি সংক্ষিপ্ত এই বর্ণনাটি —*'পরনে নিতান্ত সাদাসিধা একখানা রাঙ্গাপেড়ে শাড়ি, হাতে এবং গলায় সামান্য দুই-একখানে গহনা কিন্তু তাহার রূপ দেখিয়া বিভা অবাক হইল।'*[২৯] সাধু গদ্যভাষায় তৎসম শব্দ 'গহনা', 'রূপের' পাশাপাশি 'রাঙ্গাপেড়ে' 'হাত' ও 'গলা' শব্দের স্বচ্ছন্দ ব্যবহারে যৌগিক বাক্যবন্ধে বর্ণনাটি রূপময়তা পেয়েছে।

বস্তুত শরৎচন্দ্রের রূপবর্ণন প্রসঙ্গটি সাধারণ সংক্ষিপ্ততায় সম্পন্ন হলেও তার চিত্রগ্রাহ্য দিকটি বিশেষ উল্লেখ্য। ভাষার সামান্যতা হারিয়ে গিয়ে বড় হয়ে উঠে নারীর ভাবসমৃদ্ধ চিত্রময়-রূপ।

'পথের দাবী' উপন্যাসটিতে স্বাধীনতা-কামী সংগ্রামী ভারতীয়দের যে-অংশ ভারতের বাইরে ব্রহ্মদেশে ইংরেজ রাজশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিল তারই কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। এই উপন্যাসের অন্যতমা নারী চরিত্র সুমিত্রা সুন্দরী। তার দৈহিক সৌন্দর্য ও বেশবাসের বর্ণনাটি শিল্পীর ভাষায় এভাবে চিত্রিত —*'বয়স বোধ করি ত্রিশের কাছে পৌঁছিয়াছে, কিন্তু যেন রাজরাণী। বর্ণ কাঁচা সোনার মত, দাক্ষিণাত্যের ধরণে এলো করিয়া মাথায় চুল বাঁধা, হাতে গাছ কয়েক করিয়া সোনার চুড়ি, ঘাড়ের কাছে সোনার হারের কিয়দংশ করিতেছে, কানে সবুজ পাথরের তৈরী দুলের উপর আলো পড়িয়া যেন সাপের চোখের মত জ্বলিতেছে — এই তো চাই — ললাট, চিবুক, নাক, চোখ, ভ্রু, ওষ্ঠাধর — কোথাও যেন আর খুঁত নাই — এ কি ভয়ানক আশ্চর্য রূপ'*[৩০] —এ বর্ণনা যেন ভাষা নয়, এ যেন এক সজীব ছবি হয়ে উঠেছে। ছোটো ছোটো বাক্যাংশে গ্রথিত যৌগিক বাক্যে ভাষা সার্থক চিত্রকল্পতা পেয়েছে। তদ্ভব শব্দ—'কাঁচা', 'সোনা', 'এলোচুল', 'ঘাড়', 'সাপ' ইত্যাদির পাশাপাশি 'কিয়দংশ' 'ওষ্ঠাধর' ইত্যাদি তৎসম শব্দের প্রয়োগে ভাষা প্রত্যক্ষতার স্পর্শ পেয়েছে। সাধু ভাষার সহজ সাবলীলতা বর্ণনার শিল্প গৌরবকে বাড়িয়ে তুলেছে।

এই উপন্যাসের অপর বিশেষ নারীচরিত্র 'ভারতী' মুক্তিকামী ভারতবাসীর স্বাধীনতা-যুদ্ধের যিনি পরোক্ষ অংশীদার সেই আপাত সহজ সাধারণ অথচ অন্তরে ব্যক্তিত্বময়তার অনড় নারীটির সহজ সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা আমাদের বিস্মিত করে — ভাষায় সেই সংক্ষিপ্ততার সুর বেজে ওঠে — *'তাহার রঙ ইংরাজের মত সাদা নয়, কিন্তু খুব ফরসা। বয়স উনিশ-কুড়ি কিংবা কিছু বেশিও হইতে পারে এবং একটু লম্বা বলিয়াই বোধ হয় কিছু রোগা দেখাইল। উপরের ঠোঁটের নীচে সুমুখের দাঁত-দুটি একটু উঁচু মনে না হইলে মুখখানি বোধ করি ভালই। পায়ে চটি জুতা, পরণে চমৎকার একখানি মাদ্রাজী শাড়ি,'*[৩১] —সাধুগদ্যের সহজ শব্দ চয়নে যৌগিক ও ~~জটিল~~ বাক্যবন্ধে গঠিত বিবরণে নারীরূপ বর্ণিত হয়েছে। 'রোগা', 'ফর্সা', 'ঠোঁট', 'দাঁত' ও 'পরণে' ইত্যাদি তদ্ভব প্রচলিত শব্দ চয়ন বর্ণনাটিকে স্বচ্ছন্দতা দিয়েছে।

'শেষ প্রশ্ন' উপন্যাসে শরৎচন্দ্র নীতি-সংস্কার ও মূল্যবোধ সম্পর্কে বিতর্কিত প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিলেন। এই উপন্যাসের প্রধানা নারী 'কমল' প্রচলিত ভাবনার বিরোধে তার নিজ

বিশ্বাসবোধে উদ্ভূত চিন্তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে ছিল অকুণ্ঠ। এই বিশেষ ব্যক্তিত্বময়ী নারীটিকে ঔপন্যাসিক বর্ণনা করেছেন অতি সংক্ষিপ্ততায় ও পরোক্ষ ভাবে অপর চরিত্রের মুগ্ধতার প্রতিফলনে যা সহজেই পাঠকের মনকে স্পর্শ করে যায়। ভাষায় পাই—*'বস্তুতঃ মেয়েটির সমস্ত দেহে শুষ্ক বলিয়া আর কোন কিছু ছিল না। জামা-কাপড় ভিজিয়া ভারী হইয়া উঠিয়াছে, মাথার নিবিড় কৃষ্ণ কেশের রাশি হইতে জলধারা গণ্ড বাহিয়া করিয়া পড়িতেছে — পিতা ও কন্যা এই নবাগতা রমণীর মুখের প্রতি চাহিয়া অপরিসীম বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া রহিলেন।'*[৩২] বর্ষণসিক্ত নারীর অপরূপ দেহ-লাবণ্য যৌগিক বাক্যবন্ধে সহজ সাধুগদ্যে উচ্ছ্বসিত হয়েছে। জলসিক্ত ফুলের মত এই রমণীর সিক্ত রূপ সহজ দু-একটি আঁচড়ে লেখক এঁকেছেন যা অতিকথনের একঘেয়েমিকে অতিক্রম করে চরিত্রটিকে ব্যঞ্জনা দান করেছে।

'বিপ্রদাস' উপন্যাসটিতে শরৎচন্দ্র সনাতন হিন্দু-ঐতিহ্যের প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন। আধুনিক চেতনার সঙ্গে প্রচলিত সনাতন ভাবনার বিরোধে সনাতন আদর্শই জয়ী হয়েছে। এখানে এই উপন্যাসের আকর্ষণীয় নারী চরিত্র বন্দনা আধুনিকা ও শিক্ষিতা। সপ্রতিভ এই আধুনিক নারীটিকে লেখক রূপায়িত করেছেন এভাবে —*'বিশেষতঃ গায়ের রঙটা যেন সাদার ধার ঘেঁষিয়া আছে — এমনি ফরসা। দেহের গঠন ও মুখের শ্রী অনিন্দ্যসুন্দর'*[৩৩] — জটিল ও সরল বাক্যে 'বিশেষতঃ ইত্যাদি অব্যয়ের বাক্যের প্রথমে অবস্থানে ও 'অনিন্দ্যসুন্দর' ইত্যাদি তৎসম শব্দ প্রয়োগে ভাষা ব্যাকরণগত পরিসীমা ছাড়িয়ে চিত্রময় হয়ে উঠেছে।

শরৎ-উপন্যাসের আলোচনায় আমরা লক্ষ করলাম যে তাঁর বর্ণিত নারী-চরিত্ররা সকলেই কমবেশী ব্যক্তিত্বময়ী। তাদের চরিত্রের আভা তাদের রূপকে বর্ণময়ী করে তুলেছে, এতে অতি সাধারণ নারীও হয়ে উঠেছে অসাধারণ। রূপবর্ণনার ভাষাশিল্পে শরৎচন্দ্রের ব্যঞ্জনাময় মিতভাষিতা বঙ্কিম-রবীন্দ্র উত্তরপর্বে তাঁর প্রতিভাকে স্বতন্ত্র করেছে।

শরৎ-উত্তর কালে উপন্যাসের বিষয়ভাবনায় নব রূপান্তর দেখা দিল। নাগরিক জীবনের হতাশা-জনিত ব্যর্থতার পাশাপাশি উপনিবেশী মধ্যবিত্তের চাকরি-জনিত অনিয়শ্চতা তথা অর্থনৈতিক দোলাচলতা ইত্যাদির কারণে সমকালীন লেখকদের উপন্যাসের বিষয় হয়ে উঠল চেনা -পরিচিত পরিবেশ ছাড়িয়ে কিছুটা অচেনা ভৌগোলিক অঞ্চলের জনসমাজ ও তাদের জীবন স্বভাব।

'তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়' বীরভূম-বর্ধমান-বাঁকুড়ার বিশেষ আঞ্চলিক পরিবেশের জনজীবন বিশেষত নীচু তলার মানুষের জীবনযাত্রার অনুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন। হাড়ি বাগদী ডোম ইত্যাদি জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি বাউল, বৈরাগী, বোষ্টম, কবির দল ঝুমুরের দল প্রভৃতি তার রচনায় বর্ণময় আভা এনেছে—যা সমকালের প্রেক্ষিতে ছিল সম্পূর্ণ নতুন। নারী চরিত্র ও তাদের রূপ আমাদের চেনা-বৃত্তের থেকে একেবারেই ছিল অপরিচিত।

'কবি' উপন্যাসে 'ঠাকুর-ঝি' মেয়েটিকে নিতাই কবিয়াল' ভালবাসে। মেয়েটির রূপে মুগ্ধ হয় নিতাই। লেখক ঠাকুরঝিকে বর্ণনা করেন এইভাবে —*'ধপধপে মোট কাপড় পরা, হাল্কা কাশফুলের মত চলিয়াছে ঠাকুরঝি; মাথায় সোনার টোপরের মত ঝকঝরে পিতলের ঘটি। ... ঢ্যাঙা নয়, অথচ সরস কাঁচা বাঁশের পর্বের মত অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিতে বেশ একটি চোখ জুড়ানো লম্বা টান আছে। ওই দীঘল ভঙ্গিটি নিতাইয়ের সবচেয়ে ভাল লাগে। আর ভাল লাগে তাহার কালো কোমল শ্রী।'*[৩৪] ছোটো ছোটো বাক্যাংশে গ্রথিত দীর্ঘ বিবৃতিতে কাশফুলের সঙ্গে উপমিত হয়েছে ঠাকুরঝি। সাধু ভাষা চিত্রধর্মিতা পেয়েছে 'চোখজুড়ানো লম্বা টান' দীঘল ভঙ্গিটি কালো কোমল শ্রী ইত্যাদি শব্দ ব্যবহারে। কালো মেয়েটি কবি-নিতাইয়ের মনে বিশেষ প্রেরণা দিয়েছে।

এই উপন্যাসের অপর প্রধানা নারী ঝুমুর দলের 'বসন্তকে' লেখক উপস্থাপিত করেছেন এ ভাবে —*'একটি দীর্ঘ কৃশতনু গৌরাঙ্গী মেয়ে। অদ্ভুত দুইটি চোখ। বড় বড় চোখ দুইটার সাদা ক্ষেতে যেন ছুরির ধার —সেই শানিত দীপ্তির মধ্যে কালো তারা দুইটা কৌতুকে অহরহ চঞ্চল। বৈশাখের মধ্যাহ্ন রৌদ্রের মধ্যে যেন নাচিয়া ফিরিতেছে মধুপ্রমত্ত দুইটা কালো পতঙ্গ -- মরণজয়ী দুইটা কালো ভ্রমর।'*[৩৫] —সাধু গদ্যে উৎপ্রেক্ষা অলংকারে কৃশতনু গৌরাঙ্গী মেয়েটির রূপ ঝলসিয়ে উঠেছে। ভাষার তীক্ষ্ণতা মেয়েটিকে সকলের মধ্যে আলাদা করেছে। মেয়েটির রূপের বর্ণনায় কথা সাহিত্যিক অপরিচিত পৃথিবীর গন্ধ রাঢ়-বাংলার অজানা জনপদ, তাদের মানুষজনের স্পর্শ বয়ে এনেছেন।

শরৎ পরবর্তী 'জগদীশ গুপ্তে'র রচনায় শরৎচন্দ্র সুলভ জীবন-প্রেম ও মানবিক অনুভূতি, ও দরদী জীবনদৃষ্টি নেই, আছে জগৎ-জীবন সম্পর্কিত এক নির্লিপ্ত মোহহীন কঠিন বাস্তবতা। নারী সম্পর্কিত ভাবনাতে তাঁর এক আশ্চর্য মায়াহীন ঔদাসীন্য চোখে পড়ে ভাষাতেও পাই তারই ছোঁয়া। 'লঘুগুরু' উপন্যাসে দেহোপজীবনী উত্তমের রূপের বর্ণনায় লেখকের ভাষা— *'রং ফর্সাও*

নয়, কালোও নয়; মোটাও নয় রোগাও নয়, তার স্বাস্থ্য ভাল, গড়ন লম্বাটে —সেইজন্যেই দোহারা দেখায় —পরণে গঙ্গা-যমুনা পাড় শাড়ী, সাদা সেমিজ; নাকের অগ্রভাগ একটু চাপা, টানা টানা ভুরু, বড় বড় চোখ ইত্যাদি[৩৬] — খণ্ড খণ্ড বাক্যাংশে নির্ভর দীর্ঘ বর্ণনায় মেয়েটির দৈহিক রূপ যৌনগন্ধী বাস্তবতায় প্রকাশিত হয়েছে। শরৎচন্দ্রের ভাষা থেকে এ-ভাষা অনেক দূরবর্তী।

'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়' মানুষের মনের বিচিত্র গহনতাকে উপন্যাসের বিষয় করে তুলেছিলেন। শরৎচন্দ্রের রচনায় নির্যাতিত লাঞ্ছিত মানবের মর্মব্যথা ভাষা পেয়েছিল যেটি মানিকের রচনায় স্পষ্টকারে দেখা দিল—জীবনকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য লড়াই, ক্ষুধা ও কাম চরিতার্থ-প্রবৃত্তি তাড়িত জীবন তাঁর রচনার বিষয় বস্তু হয়ে উঠল।

'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে পদ্মা-তীরবর্তী ধীবর জীবনের আলেখ্য বর্ণনায় সে অঞ্চলের মানুষদের প্রাত্যহিক জীবনাধারণের সংগ্রামের অনুপুঙ্খু বর্ণনা পাওয়া যায়। এর সঙ্গেই পাওয়া যায় নরনারীর পারস্পরিক সম্পর্কের জটিলতাময় চায় অভিব্যক্তি-কামনা-বাসনাময় উদ্বেলিত চিরন্তন মানব-মন। কপিলার রূপ কুবের মাঝিকে আলোড়িত করে তার দুর্বোধ্য রূপের ধাঁধায় কুবের বিহ্বল হয়ে যায়। এই নারীর রূপের বর্ণনায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাবলীলতা লক্ষণীয় —*'ডুবে শাড়ি পরিয়াছে কপিলা, চুলের তেলে কপাল ভিজিয়া গিয়াছে। দেহ যেন উথলিয়া উঠিয়াছে, কপিলার, বর্ষার পদ্মার মতো। কী ভীষণ খুসী মনে হইতেছে কপিলাকে।'*[৩৭] —সাধু বাক্যে কর্তৃপদের শেষে অবস্থানে ও পদ্মার সঙ্গে নারীর দেহের উপমায় উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারে ভাষা নদীর মতই প্রবহমানতা পেয়েছে ও নদীর মত দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে।

আলোচনা সূত্রে বলতে পারি যে শরৎ সমকালীন ঔপন্যাসিকদের জীবন ভাবনার বিচিত্রতা তাদের নারীবিষয়ক ভাবনাকে প্রভাবিত করেছিল তাই তাদের রূপবর্ণনার ভাষাতেও সেই বিচিত্র এক অচেনা মাত্রা আমাদের মনকে আবিষ্ট করে, অপরিচিত এক অনুভবে আমরা অভিভূত হই।

শরৎচন্দ্র তাঁর রচনাতে সবসময়ই আমাদের এক অতি-পরিচিত চেনা-বৃত্তের চৌহদ্দিতেই বিচরণ করেছেন। অতি-চেনা মানবজীবনের কাহিনির রূপকার তিনি। তাদের সুখ-দুঃখ তাদের পাওয়া-না পাওয়ার বেদনাকে অভিব্যক্তি দিয়েছেন। নর-নারীর উপস্থাপনায় বিশেষত নারীর রূপ-বর্ণনার ভাষাতে তাঁর কোথাও অঞ্চলগত স্থানিক বিশেষত্ব বা কোথাও মনস্তত্ত্বগত বিশ্লেষণের

প্রয়োজন নেই - আছে অতি সাধারণে অসাধারণ কিছু দীপ্তি, আছে অতি সীমিত সংক্ষিপ্ত বর্ণন - যা মিতভাষনেই অসামান্যের ব্যঞ্জনা দেয়। সেই ব্যঞ্জিত দেয় সেই ব্যঞ্জিত ভাষা-আবহে নারী রূপাময়ী হয়ে ওঠে - তার অন্তর ও বাহির দুইই পাঠকের মনশ্চক্ষে ধরা পড়ে।

তথ্যসূত্র ঃ

১. চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র, কপালকুণ্ডলা; বঙ্কিম রচনাবলী; প্রথম খণ্ড, ৩২, এ আপার সারকুলার রোড, কলকাতা - ৯, সাহিত্য সংসদ; প্রথম প্রকাশ ১৩৬০; নবম প্রকাশ ১৩৮৭; পৃ. ৯২।

২. চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র, চন্দ্রশেখর, বঙ্কিম রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, সাহিত্য সংসদ; ৩২, এ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা -৯; প্রথম প্রকাশ ১৩৬০; পৃ. ৩৫৪।

৩. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, চোখের বালি; রবীন্দ্র রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), বিশ্বভারতী গ্রন্থণ বিভাগ; ১৪০২; পৃ. ৩৯।

৪. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, ঘরে বাইরে রবীন্দ্র রচনাবলী; (চতুর্থ খণ্ড); ঐ; পৃ. ৪৯৮।

৫. ঘোষ অজিতকুমার, জীবনশিল্পী শরৎচন্দ্র, সাহিত্যলোক, ৩২/৭ বিডন স্ট্রীট, কলকাতা - ৬, প্রথম প্রকাশ ১৯৪৮, পৃ. ৫০।

৬. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, বড়দিদি, শরৎচন্দ্র সাহিত্য সমগ্র - ১; আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা - ৯, ১৪০২ সংস্করণ, পৃ. ৫।

৭. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, বিরাজ বৌ, শরৎসাহিত্য সমগ্র -১; ঐ; পৃ. ৩৩।

৮. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, পরিণীতা, শরৎসাহিত্য সমগ্র -১; ঐ; পৃ. ৭০।

৯. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, পণ্ডিত মশাই, শরৎসাহিত্য সমগ্র - ১; ঐ; পৃ. ৯৪।

১০. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, পণ্ডিত মশাই, শরৎসাহিত্য সমগ্র -১; ঐ; পৃ. ১০৯।

১১. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, পল্লীসমাজ, শরৎসাহিত্য সমগ্র -১, ঐ; পৃ. ১৫৭।

১২. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, পল্লীসমাজ, শরৎসাহিত্য সমগ্র - ১; ঐ; পৃ. ১৪১।

১৩. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, শ্রীকান্ত, প্রথম পর্ব, শরৎসাহিত্য সমগ্র - ১; ঐ; পৃ. ২৯৭।

১৪. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, শ্রীকান্ত, চতুর্থ পর্ব, শরৎসাহিত্য সমগ্র - ১; ঐ; পৃ. ৪৯২।

১৫. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, শ্রীকান্ত, (প্রথম পর্ব); ঐ; পৃ. ২৮৫।

১৬. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, শ্রীকান্ত, (দ্বিতীয় পর্ব); শরৎসাহিত্য সমগ্র - ১; ঐ; পৃ. ৩৩৮।

১৭. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, শ্রীকান্ত, (তৃতীয় পর্ব); শরৎসাহিত্য সমগ্র -১ ঐ; পৃ. ৪১৩।
১৮. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, শ্রীকান্ত, চতুর্থ পর্ব, শরৎসাহিত্য সমগ্র -১; ঐ; পৃ. ৪৬৫।
১৯. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, দেবদাস, শরৎসাহিত্য সমগ্র -১; ঐ; পৃ. ৫৩২।
২০. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, চরিত্রহীন, শরৎসাহিত্য সমগ্র -১; ঐ; পৃ. ৬২৭-৬২৮।
২১. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, চরিত্রহীন, শরৎসাহিত্য সমগ্র -১; ঐ; পৃ. ৭৩৩।
২২. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, চরিত্রহীন, শরৎসাহিত্য সমগ্র -১; ঐ; পৃ. ৮৫৯।
২৩. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, দত্তা, শরৎসাহিত্য সমগ্র -১; ঐ; পৃ. ৮০৬।
২৪. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, গৃহদাহ, শরৎসাহিত্য সমগ্র -১; ঐ; পৃ. ৮৫৯।
২৫. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, গৃহদাহ, শরৎসাহিত্য সমগ্র -১; ঐ; পৃ. ৮৯০।
২৬. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, বামুনের মেয়ে, শরৎসাহিত্য সমগ্র -১; ঐ; পৃ. ১০০৯।
২৭. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, দেনাপাওনা, শরৎসাহিত্য সমগ্র -১; ঐ; পৃ. ১০১৯।
২৮. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, দেনাপাওনা, শরৎসাহিত্য সমগ্র -১; ঐ; পৃ. ১০৩৩।
২৯. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, নববিধান, শরৎসাহিত্য সমগ্র -২; ঐ; পৃ. ১১০৭।
৩০. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, পথের দাবী, শরৎসাহিত্য সমগ্র -২; ঐ; পৃ. ১১৭১।
৩১. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, পথের দাবী, শরৎসাহিত্য সমগ্র -২; ঐ; পৃ. ১১৩৬।
৩২. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, শেষ প্রশ্ন , শরৎসাহিত্য সমগ্র - ২; ঐ; পৃ. ১২৭৩।
৩৩. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, বিপ্রদাস, শরৎসাহিত্য সমগ্র - ২; ঐ; পৃ. ১৩৯৩।
৩৪. বন্দ্যোপাদ্যায় তারাশঙ্কর, কবি; মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স; ১০, শ্যামাচরণ স্ট্রীট, কলকাতা - ৭৩; বিংশ মুদ্রণ, ১৪০৩; পৃ. ৩৩।
৩৫. বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর, কবি; ঐ; পৃ. ৫৮।
৩৬. গুপ্ত জগদীশ, লঘু গুরু, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লি., ১১ - এ বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়, স্ট্রীট, কলকাতা - ৭৩; প্রথম প্রকাশ ১৩৮৪; পৃ. ১০।
৩৭. বন্দ্যোপাধ্যায় মানিক, পদ্মানদীর মাঝি; বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড; ১৪, বি বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা - ৭৩; দ্বাত্রিংশ মুদ্রণ, ১৪০৮; পৃ. ৮৪।

****